ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

পরিবেশ ও সভ্যতার সঙ্কট ঃ একটি নৈতিক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ কামরুল আহসান*
এ, এস, এম, আনোয়ারুল্লাহ ভূইয়া**

Conflict of Environment and Civilization : A Moral Review

Mohammad Quamrul Ahsan
A. S. M. Anowarullah Bhuiyan

Abstract: Interactions between man and environment is extensive and it is a must for human survival on earth including all living organisms. But human use of nature has been so large and sophisticated due to the tremendous advancement in science and technology . This sort of human activities and understanding put some significant adverse impacts on the environment. Current researches on environment crisis have proved that each sweeping of the modern science affect not only lives and ecosystem but also civilization that have made by humans on earth through out the last thousands of years. And trouble with civilization is a threat to both existing and future generation of human beings. However, we can well face the crisis of our civilization that is made by us, through changing our present behavior pattern with nature in accidence with direction of the spirit of modality and world religion's common view i.e. solidarity. Besides sustainable development and the opinions of experts in this area are also equally important and essential for achieving the same goal.

---

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
** প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বে কৃত্রিম পন্থায় ভূ-প্রকৃতি তথা পরিবেশকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করা হচ্ছে। ফলে জীব বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। নিঃশেষ-প্রায় ভূ-গর্ভের সম্পদ, বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্পপণ্য আর রাসায়নিক দ্রব্যের সম্ভার। একমাত্র সত্য যে, প্রকৃতি তার গর্ভগৃহে এগুলি তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। প্রকৃতির এই মজুদকৃত সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, সাম্রাজ্য আর বাণিজ্যের সৌধ। ফলতঃ নিঃশেষ হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে রাসায়নিক বিজ্ঞানের। সম্পদ ফুরিয়ে মানুষের কৃত্রিম নির্ভরতা ক্রমশ বেড়েই চলছে। এই নির্ভরতা একদিকে যেমন পরিবেশকে দূষিত করছে অন্যদিকে সভ্যতার সঙ্কটকেও বর্ধিত করে তুলছে। এসব পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালে পরিবেশবিদ্যা নতুন এক সভ্যতার রূপরেখার প্রস্তাব করছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য টেকসই উন্নয়ন এবং নৈতিকতার গুরুত্ব কতোটা ভূমিকা রাখতে পারে তারই সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব।

পরিবেশ সঙ্কট

মানুষের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষ কোন না কোনভাবে জীবন ও ভৌত পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের নিরাপদ জীবন প্রবাহ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আন্তক্রিয়ার ভারসাম্যের উপর। খুব সহজ করে বলা যায় - মানুষ তার খাদ্যের জন্য মাটি, পানি, বায়ু ,উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনোবা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল । মানুষের সঙ্গে পরিবেশের এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সাধারণ খাদ্য শৃঙ্খলকে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল উল্লেখপূর্বক দেখানো যেতে পারে পরিবেশ বা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড়। উপরোক্ত খাদ্যশৃঙ্খলে উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর আন্তসর্ম্পক শক্তির প্রবাহের মাত্রানুযায়ী আমরা তৃণভোজী জীব, মাংসাসী জীবের সঙ্গে যে সম্পর্ক রয়েছে তা দেখাতে পারি।
প্রাণী হিসেবে মানুষের পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা অবিচ্ছেদ্য। খাদ্য শৃঙ্খলের দিক থেকে, শক্তি ও তাপ অর্জনের দিক থেকে এবং বস্ত

সংস্থানগত দিক থেকে পরিবেশের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা অনিবার্য। পরিবেশের উপর মানুষের এই নির্ভরশীলতার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়দায়িত্ব আমাদের নিজস্ব প্রাণ সংরক্ষণের দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। কিন্তু আমাদের জীবনকে সুখময় এবং সহজসাধ্য করার জন্য পরিবেশকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করে চলছি। যা আমাদের তাৎক্ষণিক সুখ নিশ্চিত করলেও আমাদের বসবাসকারী ভূমণ্ডলকে বসবাস অনুপযোগী করে তুলছে। তার-ই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল–

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব ঃ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত এমনকিছু খাদ্য সংযোজন বস্তু, সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান এবং কীটপতঙ্গ নাশক ব্যবহার করি যা পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর। নিম্নের চার্টগুলি লক্ষ্য করা যাক

ছক-১

টক্সিন পদার্থ	ক্ষণস্থায়ী প্রভাব	দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দূষিত বায়ু		√
সিগেরেটের ধোঁয়া	√	√
কীটনাশক	মাথাধরা, হাল্কা কাশি	দেহে প্রবল আক্ষেপ সৃষ্টি হয়

ছক-২

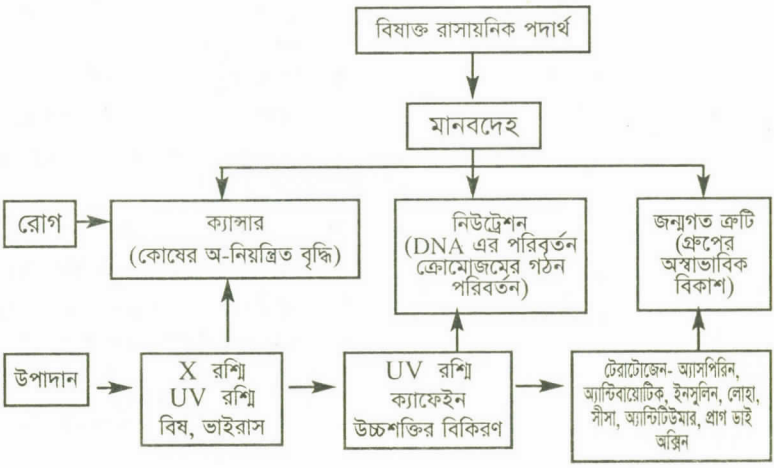

সংস্থানগত দিক থেকে পরিবেশের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা অনিবার্য। পরিবেশের উপর মানুষের এই নির্ভরশীলতার কারণে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়দায়িত্ব আমাদের নিজস্ব প্রাণ সংরক্ষণের দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। কিন্তু আমাদের জীবনকে সুখময় এবং সহজসাধ্য করার জন্য পরিবেশকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত করে চলছি। যা আমাদের তাৎক্ষণিক সুখ নিশ্চিত করলেও আমাদের বসবাসকারী ভূমণ্ডলকে বসবাস অনুপযোগী করে তুলছে। তার-ই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল–

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব ঃ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত এমনকিছু খাদ্য সংযোজন বস্তু, সৌন্দর্যবর্ধক উপাদান এবং কীটপতঙ্গ নাশক ব্যবহার করি যা পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর। নিম্নের চার্টগুলি লক্ষ্য করা যাক

ছক-১

টক্সিন পদার্থ	ক্ষণস্থায়ী প্রভাব	দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দূষিত বায়ু		√
সিগেরেটের ধোঁয়া	√	√
কীটনাশক	মাথাধরা, হাল্কা কাশি	দেহে প্রবল আক্ষেপ সৃষ্টি হয়

ছক-২

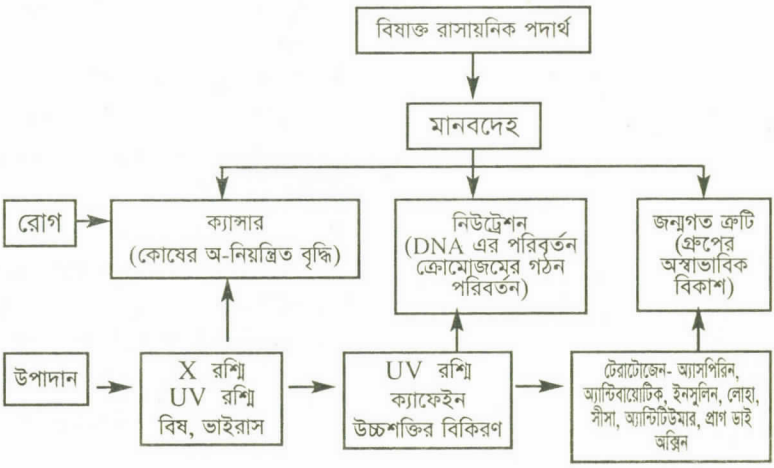

ছক-৩

মানুষের উপর Food Additives এর প্রভাব -

খাদ্যের নাম	অপমিশ্রিত উপাদান	প্রভাব
মিঠাই, আইসক্রীম বেসন মাখন চিনি মশলা	অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মেটানিল ইয়ালো স্যাকারিন (টেট্রোলিয়াম জাত) খেসারীর গুড়া (জৈব যৌগ B-N-Oxayl , সাকারিন চক পাউডার অ্যারো কোলিন	এসব উপাদান সব রকম টক্সিক উপাদান হিসেবে বিবেচ্য, খাদ্যের এসব উপাদান অনেকক্ষেত্রেই শরীরে বিভিন্ন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- পঙ্গুত্ব, হৃদরোগ,
সন্দেশ (ভোজ্য তৈল)	অ্যালুমিনিয়াম পাত রোডমিল বি ট্রাই-অর্গে-ক্রিসাইল ফসফেট	

পেস্টিসাইডের প্রভাব

ক. ইনসেক্টিসাইড ঃ	রাসায়নিক উপাদান	ক্রিয়ার প্রভাব
	ডিডিটি	ডিডিটি ব্যবহার ঃ ১. বিভিন্ন পশুপাখির জনন অক্ষমতা সৃষ্টি করে থাকে ২. জলে অদ্রাব্য। ফলে ডেট্রিক্স ও ডিকম্পোজার খাদ্যশৃঙ্খলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। ৩. Bio-activation থাকার কারণে ডিডিটি সহজে চর্বি ও অন্যান্য কোষে প্রবেশ করে। ৪. ডিডিটির বিষক্রিয়ায় মৃত্যু না হলেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। কোষীয় শৈথিল্য, নিউরোনের

অপ্রজনন, স্নায়বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

টক্সফিন ঃ
১. মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে অধিকতর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।
২. প্রাণীর দেহে সম্পৃক্ত হয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি করে।
৩. দৌর্বল্য, স্নায়বিক বিকার, বমি ভাব, মাথা ধরার সৃষ্টি করে থাকে।

অলড্রিন, ডায়েলড্রিন এন্ডিনঃ
১. মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া, স্নায়বিক বিকার, পেটের যন্ত্রণা, মাথাঘোরা সৃষ্টি করে থাকে।
২. ঈগল, হাঁস ও মুরগীর বংশবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে।

ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর ঃ
১. যকৃৎ, বৃক্ক ও ফসুফুসে বিষক্রিয়ার সৃস্টি করে।
২. এ রাসায়নিক শিল্পে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের নিউকিমিয়া হয়ে থাকে।

ডাইক্লোরফোম, প্যারনিয়ন, ম্যালথিয়ান ঃ
মাছি, মশা ও অন্যান্য পতঙ্গ ধ্বংস করতে এই রাসায়নিক উপাদনগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পরিবেশের প্রভাব ঃ
১. মানসিক বিকার ও অ্যামনিয়ায় ঘটে থাকে।
২. গর্ভপাত ঘটে থাকে।

৩. বমি ও ডায়েরিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
৪. দৃষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে।

খ. **হার্বিসাইড**

অ্যাট্রাজিন ঃ পানি দূষণ করে থাকে

মেটোলাক্লোর ঃ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে ফুসফুস ক্ষতের সৃষ্টি করে।

ডাইঅক্সিন ঃ এর লিপিড় দ্রাব্যতার কারণে ডাই-অক্সিন অতি সহজে খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে মানুষের স্বাস্থ্য হানি ঘটিয়ে থাকে।

উল্লিখিত মানবসৃষ্ট রাসায়নিক দূষণগুলোর পাশাপাশি মানবকর্তৃক বায়ূ-দূষণের প্রভাব ও সভ্যতার যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত ও নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখিন করে তুলেছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে যতটা না বায়ুকে দূষিত করা হচ্ছে - তার থেকে বেশি পরিমাণে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু দূষণ করা হচ্ছে। নিম্নের চার্টে বায়ুদূষণের বিভিন্ন উৎস, দূষক পদার্থ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব দেখানো হল -

বায়ু দূষণের উৎস ও দূষকঃ

ছক-৪

উৎস	দূষক
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কলকারখানা শিল্প প্রক্রিয়া করণ রেফ্রিজারেটর কয়লা, গ্যাস, কেরোসিন পরিবহণ শিল্প	Sox, Nox, Co, Cos, N_2S, NH_3, No, So_3, HF, Sr-90, CS-134, অ্যারোসল, O_3, Cl, ক্লেরণ,

প্রভাব ঃ	
Sox →	শ্বাসনালীর স্ফীতি, অ্যাজমা, নাসিকার জ্বালা সৃষ্টি করে, ব্রঙ্কাইটিস
Co →	মাথাধরা, ঝিমুনি, দৈহিক সামর্থ্য হ্রাস করে।
No →	ব্রঙ্কাইটিস

শিল্প কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থ, পেস্টিসাইড ও আর্সেনিকের ক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বের আরেকটি উপাদান জলকে দূষিত করে যাচ্ছে। ফলে আমাদের ব্যবহার উপযোগী পানির পরিমাণ ও জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। ফলতঃ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ভূ-বৈচিত্র্য। এভাবে প্রাণী ও মানুষের উপর জলজ দূষণ কু-প্রভাব ফেলছে। ফলে মানুষ যেমন, বিষক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, একইভাবে জলজ প্রাণীসমূহের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে যা আমাদের প্রোটিন ও পুষ্টির ঘাটতি ঘটাচ্ছে।

সভ্যতার সঙ্কট

স্থূল প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ থেকে মানুষ তার পরিবেশ ও প্রতিকুলতাকে জয় করে জীবনযাত্রাকে একটি মাত্রায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়। আর এভাবে মানুষ যখন নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্যাদি এবং নিজস্ব মূল্যবোধকে নির্মাণ করে একটি সাধারণ ঐতিহ্যকে প্রবাহিত করতে প্রয়াসী হয় তখন তাকে আমরা সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করে থাকি (আলম,২০০১,২-৩)। সভ্যতার এই ধারাবাহিকতায় মানুষ নিজেকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে পৌছাঁয় যখন মানুষ প্রকৃতিকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং একটি উচ্চতর জটিল সাংস্কৃতিক প্যাটার্ণ নির্মাণ করতে সক্ষম হয। কিন্তু সভ্যতা বিনির্মাণের মূল চালিকাশক্তি হল– উর্বর পুষ্টিযোগ্য ভুমি, অনুকূল জলবায়ু, উত্তম পোতাশ্রয় এবং প্রচুর পরিমাণের খসিজ সম্পদ। অর্থাৎ সভ্যতার বিকাশে একটি উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন যা দূষণযুক্ত, ভারসাম্যহীন ও বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠে না। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে মানব-সৃষ্ট বিভিন্ন যন্ত্র-কৌশল আগামী দিনের সভ্যতাকে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সঙ্গত কারণে এভাবে বিপর্যস্ত

হচ্ছে পরিবেশ, বিলুপ্ত হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রাণীকূল। জীবীয় (biotic) কিংবা অজীবীয় (abiotic) উপদানের উপর মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্ভরশীলতা অনস্বীকার্য। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনসমূহ মিটাবার তাগিদে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করছি বিভিন্নভাবে। অনেকক্ষেত্রেই আমরা ভুলে যাই যে মানুষ ও সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়ার উপর। সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা একে আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যস্ততা, শিল্প কলকারখানার লাগামহীন বিকাশ পরিবেশের উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের বাজার দখলের একচেটিয়া মানসিকতার উপর ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে, বর্জ্য ও বিষাক্ত আবর্জনা ভূ-পৃষ্ঠ তথা নদ-নদী ও সাগরের পানিকে বিষিয়ে তুলছে। ফলতঃ পরিবেশের উপর নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেই প্রভাব অন্য অর্থে মানব-সভ্যতাও আক্রান্ত হচ্ছে।

সভ্যতার ভবিষ্যত

সভ্যতার বিকাশের নামে আমরা মূলত আগামী দিনের সভ্যতার সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করছি। পারমাণবিক শক্তি তথা মহাকাশচারণবিদ্যা আমাদের সাম্প্রতিক সভ্যতার নিদর্শন হলেও তা মুলত আগমী দিনের পৃথিবীকে বসবাস অনুপযোগী করে তুলছে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কিভাবে মানবজাতি ও জীবমণ্ডলের উপর দানবীয় আঘাত হানার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে—হিরোশিমা ও নাগাসাকিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন বিজ্ঞানী তাই অপরাধের শোচনীয় ফলাফলে আতঙ্কিত হয়ে বলেন, জ্ঞানান্বেষণের সনাতন পন্থায় আমূল পরিবর্তন আসছে। কারণ বিজ্ঞান যেখানে মানুষকে কল্যাণ ও সত্যের পথ প্রশস্ত করবে সেখানে বিজ্ঞানের অপতৎপরতায় মহাশক্তিধর হবার ভুমিকায় অবতীর্ণ হবার প্রতিযোগিতায় অনেকেই আমরা নামছি। মহাশূন্যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ, সমর প্রতিযোগিতা কিংবা পারমাণবিক পরীক্ষা ইত্যাদি হল আধুনিক বিজ্ঞানের নেতিবাচক ফলাফল।

উন্নত সমাজ ও মহাশক্তিধর হবার মানসিকতায় যখন মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে শুরু করলো সেই থেকে বিজ্ঞান মানব উন্নয়ন অপেক্ষা পরিবেশ সমস্যা ও সভ্যতার সঙ্কটকে প্রকট আরো করে তুলছে। এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করা যায়—১৯৬২ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০০ কি. মি. উপরে একটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীর চারপাশে তীব্র বিকিরণের একটি বলয় গড়ে উঠে। এই বিকিরণ বিভিন্ন গবেষণায় পাঠানো অধিকাংশ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে বিকল করে দেয়, রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং মহাকাশ পরিক্রমায় তেজস্ক্রিয়া বিকিরণের বিপদ বাড়িয়ে তোলে। ১৯৬৩ সালের মে মাসে আমেরিকা মহাশূন্যে দ্বিতীয় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। যার ফলে সাড়ে তিনহাজার কি. মি. উচ্চতায় পৃথিবী বেষ্টনকারী মহাকাশে ৪০০ মিলিয়ন তামার সূচের একটি বলয় সৃষ্টি করে। এই পরীক্ষায় সামান্য বিস্তার রেডিও ও অপটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমির কাজে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে (Ursul, 1983, 120)। এভাবে পরীক্ষার নামে কিংবা রাষ্ট্রীয় বা জাতিগত প্রতিযোগিতার নামে আমাদের পরিবেশ তথা সভ্যতাকে বিপজ্জনক অবস্থার মুখোমুখি করে দিচ্ছি। পারমাণবিক বিস্ফোরণ পৃথিবী নামক গ্রহের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রাণঘাতি তেজস্ক্রিয় কণিকা। ব্যারি কমোনার এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রতিটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ সজীব বস্তুতে, বিশুদ্ধ পরিবেশে তেজস্ক্রিয় কণা ঢুকিয়ে দেয় (Caumoneur,Bary, 1972,53)।

রেডিও বায়োলজিস্ট ও জেনেটিসিস্টদের এক গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে যে তেজস্ক্রিয় কণার ভাঙ্গনজনিত সামান্যতম বিকিরণ বহু জীবের, বিশেষ করে মানুষের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকারক। তেজস্ক্রিয় দূষণ জিনের যে ক্ষতি করে তার ফলাফল প্রকাশ পেতে ১৫-২০ বছর সময় লাগে। বিজ্ঞানীরা এটাও প্রমাণ করেছেন যে, পরিবেশের যেকোন দূষণ অপেক্ষা জীবদেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থের মজুদ শতসহস্র গুণ বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। এর ফলে মনুষ্য প্রজাতির যে ক্ষতি হয় সেটা প্রথম এমনকি দ্বিতীয়, তৃতীয় তথা চতুর্থ প্রজন্মের মধ্যে দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে, পঞ্চম প্রজন্মে গিয়ে সেটা ধরা পড়তে পারে। তাছাড়া আজকের দিনে কৃষিতে, খাদ্য উৎপাদনে কিংবা নিজ

ব্যবহার্য উপকরণাদিতে পারদ, ক্যার্ডমিয়াম, সীসা, রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করছি মানবদেহে গুপ্ত অবস্থায় তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে কিংবা বংশানুক্রমিকভাবে মানুষের রক্ত ও মস্তিস্কের গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, মানুষের চিন্তাশক্তি হ্রাস পেতে পারে। কিংবা এসব রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া মানুষকে বিকারগ্রস্ত, চিত্ত-দৌর্বল্য, উদভ্রান্ত, মানসিক বৈকল্য, ইত্যাদি নানাধরনের শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। শরীরের এসব সমস্যার কারণে মানুষের মধ্য থেকে লোপ পেতে পারে সহনশীলতা, সহানুভূতি। একই উৎকণ্ঠা নিয়ে রুশ পরিবেশ বিজ্ঞানী স্তেপানস্কি বলেন, মানুষের উপর রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রভাবের ফলে বহু পরিবর্তন ঘটছে তার মানসিক অবস্থার, বঞ্চিত করছে মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনী ক্ষমতা ও প্রধান সামাজিক ভূমিকা থেকে। মানুষের উপর রাসায়নিক পরিবেশের প্রভাবের ফলে তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য কখনো সমাজ বিরোধী চরিত্রে রূপ পায়। কিংবা শারীরিকভাবে হয়ে উঠে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, মেধাগত দিক থেকে হয়ে থাকে স্থূল ও নির্বোধ - যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের জন্য কোন সহায়কশক্তি তো নয়ই, বরং বোঝাস্বরূপ (স্তেপানস্কি, ১৯৭৩, ৩:৬৯)।

সভ্যতার বিকাশে মানুষের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের আবিষ্কার আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সভ্যতার এসব আবিষ্কারসমূহের ভুল-ভ্রান্তি প্রকৃতিতে, জীবদেহে ও সামাজিক কাঠামোতে নিয়ে আসতে পারে অভাবনীয় ক্ষতি। সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের সভ্যতাকে যতটা না সামনে নিয়ে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি আক্রান্ত করছে আমাদের বসবাস উপযোগী পরিবেশকে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশে সৃষ্টি করছে সঙ্কট।

পরিবেশ ও সভ্যতাকে তার অনিবার্য সঙ্কটের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নিরন্তর প্রচেষ্টাও রয়েছে। ১৯৫৫ সালের ৯ জুলাই 'আইনস্টাইন, রাসেল ম্যানিফেস্টো' তে পরিবেশ ও সভ্যতা সংরক্ষণে বিজ্ঞানীদের দায়-দায়িত্বের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁরাই প্রথম ভেবেছিলেন পৃথিবীতে সভ্যতা ও প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে

'নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে' - মানবজাতির প্রতি তাঁদের এই আবেদনের গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয় ম্যানিফেস্টোর ভাষায় -

> "মানবজাতি যে শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন, তাতে আমরা অনুভব করি যে বিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলনে সমবেত হওয়া প্রয়োজন। যাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভবজনিত বিপদের মূল্যায়ন করা যায় এবং সংযোজিত খসড়া দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়। এই উপলক্ষ্যে আমরা কোনো একটি জাতি, মহাদেশ কিংবা ধর্মমতের মানুষ হিসেবে কথা বলছি না, কথা বলছি মানুষ হিসেবে, মনুষ্য প্রজাতির সদস্য হিসেবে। যার এতদিনকার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।" (ম্যানিফেস্টো, ১৯৫৫)

কিন্তু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের এই আহ্বান উপেক্ষা করে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় বছরে প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনাগত প্রজন্মকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিষে বিষাক্ত করে তুলেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং, যারা অর্থ দিয়ে এসব মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করছেন, শুধু তারাই নয় বরং বিজ্ঞানীদের বুঝতে হবে তাঁদের উদ্ভাবিত কৌশলের মারাত্মক ফলাফল জনস্বাস্থ্য ও জীবমন্ডলের জন্য কতটা বিপজ্জনক। সভ্যতা ও পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিজ্ঞানীদের সামাজিক পরিবেশগত দায়দায়িত্ব পালনের প্রথম সাংগঠনিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৫ সালে জুলাইয়ে 'বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্ব ফেডারেশন' এর উদ্যোগে আয়োজিত পারমানবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণে আগ্রহী বিজ্ঞানীদের আলোচনাচক্রে, সেখান থেকে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আহ্বান জানান হয়,

> "বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ববোধের চেতনায় নতুন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরমাণু অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণের জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রয়াসের কর্তব্য গ্রহণ করছি এবং এই আশা ব্যক্ত করছি যে ঐ একই উদ্দেশ্যে কর্মরত সকল আন্দোলন এই চূড়ান্ত লক্ষ্যের অনুসরণে ঐক্যবদ্ধ হবে ও একইসঙ্গে কাজ

করবে ... পরমাণু অস্ত্রের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে সবাই পরিচালিত হবে (WFCS,১৯৬৩, ৫)।"

বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায় দায়িত্ববোধের আরো দৃঢ় বক্তব্য লক্ষ্য করা যায় ১৯৭৫ সালে ২২তম পাগওয়াশ সম্মেলনের 'বিজ্ঞান ও নীতিবোধ' আলোচনায়। পরিবেশ ও সভ্যতার সঙ্কট নিরসনে বিজ্ঞানীদের ভূমিকার গুরুত্ব আরো অর্থবহ হয়ে উঠে এই ঘোষণায়। অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীরা বলেন, বিজ্ঞানী সমগ্র মানবজাতির কাছে দায়ী, বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্যেই শুধু দায়ী নন, প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রে এবং সারাবিশ্বে বিজ্ঞানের সৃষ্টিগুলোর যে ব্যবহার ঘটে, তার জন্য যৌথভাবেও দায়ী (১৯৭৫, ১০, ৩০/১:৫৩)। বিজ্ঞানীরা ২৭ তম পাগওয়াশ সম্মেলনে (১৯৭৭) পরিবেশের প্রতি তাদের দায়-দায়িত্ববোধ নিয়ে বলেন, মানুষের কর্মকান্ড দ্বারাই যেহেতু মানবজাতি রক্ষা পেতে পারে সেহেতু আমাদেরই উচিত বিজ্ঞানের অবদানসমূহকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো (১৯৭৭)। বিজ্ঞানের উন্নয়ন আমাদের পরিবেশকে ও সভ্যতাকে সঙ্কটের মুখে নিপতিত করলেও আমাদের নিজেদের মধ্যকার সহনশীলতার চর্চা, সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি এবং নৈতিক উপলব্ধির সহায়তায় উদ্ভূত পরিবেশ সমস্যা ও সভ্যতার সঙ্কট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারি।

মানুষ ও পরিবেশিকরণ নীতি

মানুষ, বিজ্ঞান ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া আজকের দিনের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা। মানুষের উৎপাদন ও বিনোদন কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশের জৈব, ভৌত ও অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধিতহারে বেড়েই চলছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই নির্ভরশীলতা নিয়ে দুটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে ঃ

১. চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি

২. মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি।

চরমপন্থীদের দাবী হল — মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে হবে। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবন যাপন থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রকৃতি নির্ভরশীলতা

একটি অনস্বীকার্য বিষয়। শিল্প-কারখানা, উৎপাদনমুখীনতা এবং সভ্যতার সৌধ বিনির্মাণের অন্ধমোহে দিক-বিদিক না তাকিয়ে আমরা শুধু প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বিনষ্ট করে চলছি। এজন্য চরমপন্থী পরিবেশবাদীদের শ্লোগান হল 'প্রকৃতির কোলে ফিরে চল'। পরিবেশ সমস্যায় চরমপন্থীদের অবস্থান সংরক্ষণমুলক। তাদের এই মতবাদ আগামীদিনের পরিবেশ মোকাবেলায় ভূমিকা রাখলেও সভ্যতার বিকাশকে তাঁরা পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করে থাকেন। কারণ উৎপাদন ও শিল্পের বিকাশ ব্যতীত সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা যায় না। বিপরীতক্রমে, মধ্যপন্থার অনুসারীগণ শিল্পভিত্তিক উৎপাদনকে অতিমাত্রায় কিংবা নিম্নমাত্রার কোনটিকেই সমর্থন করে না। বরং তাঁরা বলেন, উৎপাদনের বিশেষ গতিকে পরিবেশ সংরক্ষণের নামে হঠাৎ করে থামিয়ে দিলে উৎপাদনের ক্ষেত্রটি ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য, উৎপাদন ও শিল্পের উন্নয়নে পরিবেশীকরণ নীতির প্রস্তাব করা যেতে পারে।

আশির দশকের দিকে পাশ্চাত্যের অনেক পরিবেশবিদ পরিবেশ সঙ্কটকে স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনবার জন্য উৎপাদন, চাহিদা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার কথা বলেন। একথা সত্য যে, ভোগের সঙ্গে উৎপাদনের একটি সম্পর্ক রয়েছে। ভোগের বৃদ্ধি ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেই তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সৃষ্ট চাপ ইত্যাদি মিলিয়ে পরিবেশ বিপর্যয় ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। এ পর্যায়ে অনেকেই হয়তো ভোগ রোধ করার সপক্ষে মতামত দিতে পারেন। কিন্তু ভোগ রোধ করার নীতি উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরে প্রভাব ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে 'ভোগ-রোধ' অপেক্ষা ভোক্তার মানসিক তৃপ্তির মাত্রাকে সম্পদের পরিমাণগত বিবেচনার উপর সীমিত রাখতে হবে। কারণ নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে কোন দ্রব্য ভোগ করাটাকে ভোগ না বলে 'পেটুকপনা' বলা যায়। পেটুক ব্যক্তির প্রকৃত বিকাশ এবং তার সামর্থ্য ও অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের বদলে তার অধঃপতন ঘটায়। সুতরাং, ভোগকে সীমিত করে উৎপাদনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারলেই উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সইয়ে নেয়া যাবে। কারণ ভোগ রয়েছে বলেই মানুষ কর্মে সক্রিয় হচ্ছে, জীবনকে সহজ করতে সমর্থ হচ্ছে। ভোগকে কেন্দ্র করেই সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বহুমুখী শাখায় বিস্তারিত হচ্ছে। উৎপাদন, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন

প্রক্রিয়ার উদ্ভব হচ্ছে যা ব্যাতীত সভ্যতাকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হত না। কিন্তু একথাও সত্য যে শিল্পের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশে ক্রমবর্ধিতহারে সমস্যা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগামী দিনের সভ্যতার সঙ্কট নিরসনের জন্য আমরা দু'ভাবে পদক্ষেপ নিতে পারি।

১. উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবেশীকরণ ও

২. উৎপাদনের জন্য পরিবেশসম্মত রূপরেখা দাঁড় করিয়ে

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ বিপর্যয় এড়ানোর জন্য পরিবেশবিদদের অনেকেই ভোগ বা চাহিদার হ্রাসকরণ এবং জনসংখ্যা রোধের কথা বলে থাকেন। কিন্তু ই. টি. ফাদায়েভ "Problems of Environmental Production" (১৯৮৩) প্রবন্ধে বলেন, চাহিদা হ্রাসকরণ বা জনসংখ্যা রোধ করে পরিবেশ সমস্যা দূরীকরণ করা যায় না। কারণ ভোক্তার ভোগের উপর ভিত্তি করে একটি উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে ভোগকেই যদি নতুন শর্ত সংযুক্ত করা হয় তাহলে সামাজিক সম্পর্কে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। আবার, জনসংখ্যা রোধ যথার্থ সামাজিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সমগ্র উৎপাদনে অধিকতর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধিও প্রয়োজন। কারণ জনসংখ্যা উৎপাদনে উৎসাহ সঞ্চার করে থাকে। কারণ যে অর্থে শিল্প বিকাশ সীমাহীন ঠিক একই অর্থে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও সীমাহীন। আর এজন্য জনসংখ্যা রোধকরণে স্থায়ী যে কোন প্রয়াসই বিপদজনক, সভ্যতার বিকাশের জন্য অবনতিসূচক। ফলতঃ এটা শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ও সমাজের বিলুপ্তি ডেকে আনতে পারে। ভোগ বা চাহিদা ও জনসংখ্যা হ্রাসকরণ নীতি গ্রহণ অপেক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থা বা শিল্পে পরিবেশিকরণ ভাবনা আশাব্যঞ্জক ফল প্রদান করতে পারে।

ই. টি. ফাদায়েভ শিল্পের পরিবেশীকরণ বলতে বুঝেছেন - 'বর্তমান শিল্পের এমন একটি রূপান্তর সাধন যা এর উন্নয়নকে ব্যাহত করবে না অথচ একে নির্ভরশীল করবে বর্তমান পরিবেশগত সীমাবদ্ধতার উপর, এবং পরিবেশে কোন নেতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করবে না। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে শিল্পের পরিবেশীকরণে ফাদায়েভ কয়েকটি প্রস্তাব করেন ঃ

শুধু উৎপাদনের একচেটিয়া মাত্রাকেই অনুসরণ করবে না। বরং পরিবেশ ও পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রাকে ইতিবাচক দিকে নিয়ে আসতে পারবে। এজন্য পরিবেশীকরণের ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য দুটি বিষয় বিবেচনার রাখা যেতে পারে ঃ

১. টেকসই উন্নয়ন এবং ২. পরিবেশ প্রভাব নিয়ামক বা Environmental Impact Assesment (EIA) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ সঙ্কট নিরসনে এ দুটি-ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে–

পরিবেশ সংরক্ষণে টেকসই উন্নয়ন ও EIA এর ভূমিকা

সভ্যতার বিকাশ ও মানব উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই প্রত্যাশাকে নিশ্চিত করতে পারে। এ দুয়ের সুষম বিকাশ নিশ্চিত করতে না পারলে পরিবেশ ও সভ্যতার সঙ্কট এমন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হবে যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন হয়ে পড়বে। এজন্য টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি বর্তমান গবেষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। টেকসই উন্নয়ন হল– প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃৎকৌশলগত উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। সাম্প্রতিককালে যত ধরনের উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় তা প্রায়শ-ই পরিবেশকে মারত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়ে-ই হচ্ছে। যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী, ইরিগেশন ইত্যাদির নামে প্রস্তাবিত প্রজেক্ট সমূহ পরিবেশকে আক্রান্ত করছে। উন্নয়নের নামে পরিবেশ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, উন্নয়ন কে যেন টেকসই করা যায় সেজন্য সমকালীন পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে Procedures of Environmental impact Assessment (সংক্ষেপে EIA)*। EIA এর মূল লক্ষ্য হলো

> " ... to determine the likely environmental consequences of a project and which environmental protection measures need to be incorporated into its design, impleamentation and operation." (CEC 1993)

EIA এর বদৌলতে আমরা অপ্রত্যাশিত পরিবেশ দূষণের হাত থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত রাখতে পারি। সংক্ষেপে EIA এর মূল লক্ষ্য হল–

* অস্তিত্বশীল পরিবেশসম্মত শর্তসমূহ নির্দেশ করা।
* কোন প্রজেক্ট বা উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হলে তা পরিবেশের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর হতে পারে তার সম্ভাবনা যাচাই করে প্রজেক্ট অনুমোদন করা।
* লাভ ক্ষতির হিসেব বিশ্লেষণ করে —প্রশমিত করা যায় না এমনসব সঙ্কটের ন্যূনতম অবস্থা পরিমাপ করে অগ্রসর হতে হবে।
* পরিকল্পনাসমূহের পুনঃ বিবেচনা করা।
* পরিবেশের ক্ষতি করে না এমনসব বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে।

কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অর্থে অবগত হয়ে, লাভ-লোকসান বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করাই হল EIA এর মূল লক্ষ্য। টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নত বিশ্বে EIA ব্যাপক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উন্নয়নের দুটি ধারায় এর দু'ধরনের প্রভাব উল্লেখ করার মত। সে দুটি হল ঃ

ক. **বহিঃভুক্তি করণ তালিকা** ঃ

১. মানব সম্পদের উন্নয়ন, উদাহরণস্বরূপ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবকাঠামো বিনির্মাণ
২. মানব স্বাস্থ্য উন্নয়ন; পরিবেশ দূষণের প্রভাব সম্পর্কীয় শিক্ষা পরিবেশবিদ্যার জ্ঞান, টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ,
৩. পরিবেশসম্পর্কিত আইন ও প্রতিষ্ঠান বর্ধন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কিত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে EIA কে ততোটা কার্যকরী করা প্রয়োজন নেই।

খ. **অন্তর্ভুক্তকরণ তালিকা** ঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে EIA নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারেঃ

১. যোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রিত পরিসরে নিয়ে আসা।

২. শক্তি উৎপাদন বায়োমাস, কয়লা, পীট, তেল ও গ্যাস, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি উৎপাদন নিষিদ্ধ করা।

৩. জলজ সম্পদ নষ্ট করতে পারে এমনসব অবকাঠামোগত উন্নয়নকে নিরুৎসাহিত করা।

৪. শিল্প-কলকারখানা সার্ভিসকে নিয়ন্ত্রিত করা।

৫. পরিবেশগতভাবে হুমকি স্বরূপ এরকম স্থানগুলোকে সনাক্ত করতে হবে, যেমন -

ক. ভারী শিল্পকারখানা

খ. সম্পদ নিষ্কাশন শিল্পসমূহ

গ. অবকাঠামোগত প্রজেক্টসমূহ

পাশাপাশি সংরক্ষণ করতে হবে -

১. জাতীয় বন-এলাকা, জলজ এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন জায়গাসমূহ

২. ম্যানগ্রোভ এলাকা ইত্যাদি।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য EIA কে সক্রিয় করার জন্য বহুমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য এবং বিশ্লেষণী সমর্থের অধিকারী হতে হবে। জনগণকে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সঙ্গে সচেতন করে তুলতে হবে। পরিবেশের সঙ্কট সৃষ্টি করে এমনসব তথ্য ও তথ্যাদির জন্য ডাটা সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এজন্য পরিবেশ সম্পর্কীয় শিক্ষা সম্প্রচার রাষ্ট্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ক্লাব, সেবা প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া আরো যেসব পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয় সেগুলো হলো -

ক. EIA বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা, আইনের সমতা ও দায়বোধ একাজে ভূমিকা রাখতে পারে।

খ. পারস্পরিক সহায়তার মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

গ. প্রতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে করে প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় কোন পরিবেশ দূষণ রোধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

ঘ. রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

নৈতিক পর্যালোচনা

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ সংরক্ষণ সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিবেশবিদগণ নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ করছেন। নৈতিকতা মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক সচেতনতা তথা বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দায়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এজন্য পরিবেশের সাম্প্রতিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য পরিবেশীকরণ, পরিবেশসম্মত উৎপাদন, টেকসই উন্নয়ন তথা EIA এর পাশাপাশি নৈতিকতাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। নৈতিকতার এই উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে পরিবেশ নীতিবিদ্যা (Environmental ethics) নামে আলাদা একটি জ্ঞানের শাখাও বিকাশ লাভ করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত পরিবেশবিদগণ বলেন, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে; সেটা হোক পরিবেশের স্বনিহিত কারণে কিংবা পরিবেশের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার কারণে। পরিবেশবাদী দার্শনিকগণ দু'দিক থেকে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দেখান। নিম্নের চার্টে তা দেখান হলু

ছক: ৫

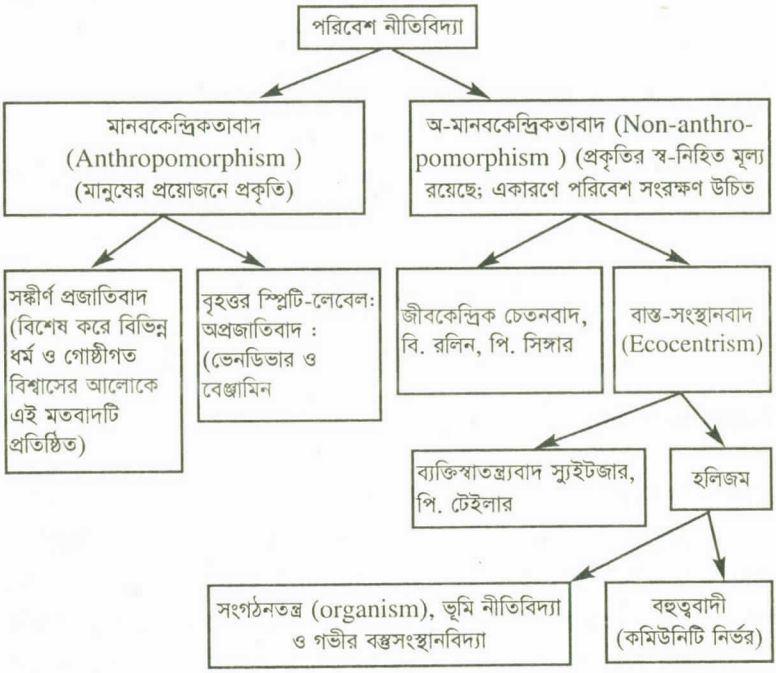

(সূত্রঃ Pojman, 2000.187)

পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের কোন দায়িত্ব-কর্তব্য আছে কিনা তা নিয়ে পরিবেশ নীতিবিদগণ দু'ধারায় বিভক্ত হয়েছেন; সে দুটি হল -

১. যারা ধর্মতত্ত্বের উপর নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চান- তারা মুলত মানুষের প্রয়োজনে পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবীয় ও অ-জীবীয় উপাদানসমূহ ব্যবহার করা যায় বলে দাবী করেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism)। এই মতবাদে মানুষকে লক্ষ্য ধরে অ-মানবীয় প্রকতিকে উপায় বা মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়।

২. অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Non-anthropocentrism) অনুসারে মানবীয় এবং অ-মানবীয় উভয়ের প্রতি যত্নশীল হবার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়।

পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত

সাম্প্রতিককালে পরিবেশ বিপর্যয় মানুষ সভ্যতা এবং তার পরিবেশকে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মানুষের আগামী নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণকে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আমরা পরিবেশ নীতিবিদদের মধ্যে বিদ্যমান দুটি বিতর্ক সংক্ষেপে আলোকপাত করতে পারি, সে দুটি হলঃ

ক. পরিবেশের কি অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে?

খ. পরিবেশ সংরক্ষণ কেন নৈতিক ?

পরিবেশের অন্তর্নিহিত মূল্য

প্রথমতঃ কোন একটি সত্তা যদি তার নিজের কারণে মূল্যবান হয়, তার মূল্যের জন্য অন্যকোন সত্যের উপর নির্ভর করতে হয় না; বরং অন্য কোনকিছু তার গুরুত্বের কারণে মূল্যবান হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সত্তাটি অন্তর্নিহিত অর্থে মূল্যবান হয়। আবার একধরনের 'মূল্য' আছে যা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে সত্তাশীল হয়ে থাকে; এদের নিজস্ব কোন স্বকীয়তা নেই। এধরনের সত্তাকে বলা হয় সহায়ক মূল্য বা বহির্মূল্য গুণ। সাম্প্রতিককালে আর্ণ নায়েসিস ও হোমস রল্‌স্টন প্রমুখ দাবী করেন যে, পরিবেশের নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। তাঁদের এপ্রসঙ্গে বক্তব্য হল কোন কিছুর মূল্য থাকার অর্থ-ই হল এটি আমাদের উপর কর্তব্য আরোপ করে। সুতরাং, মূল্যের ধারণার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বলা যেতে পারে পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। এ বিবেচনায় পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত।

পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য

পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি রকম হওয়া উচিত? নায়েসস এ প্রসঙ্গে দু'ধরনের মতবাদের কথা বলেন : ক. গভীর পরিবেশবাদ (Deep ecology) খ. অ-গভীর পরিবেশবাদ (Shallow ecology)।

দ্বিতীয় ধারা (গভীর পরিবেশবাদ) অনুসারে, দাবী করা হয়– পরিবেশের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। মানুষের জন্য-ই পরিবেশ। প্রকৃতির সম্পদসমূহ মানবমূল্যের জন্য প্রযোজ্য। পরিবেশের বায়োটিক ও সিমবায়োটিক ইত্যাদিসহ সকল প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ এগুলো আমাদের কৃষিজাত প্রয়োজন তথা ঔষধ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনে, মানবকল্যাণে যেহেতু প্রকৃতির সম্পদসমূহ ব্যবহৃত হয় সেহেতু পরিবেশ প্রকৃতি তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায় ঃ

১. পরিবেশ দূষিত হলে আমাদের জীবন যাপন অস্বাচ্ছন্দপূর্ণ হয়ে যাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

২. তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা পরিবেশের জন্য বোঝা স্বরূপ এমনকি বাস্তু-সংস্থানগত ভারসাম্যের উপর এটি ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

৩. 'সম্পদ' বলতে আমরা সেই সবকিছুকে বুঝব যেগুলো মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং, ব্যক্তিত্ববাদী বা মানবকেন্দ্রিকতাবাদী ধারায় যেসব পরিবেশবাদীগণ পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলেন, তাঁরা মানব কল্যাণের সর্বোচ্চ মাত্রাটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন আর পরিবেশ হল মানবকল্যাণের মাধ্যম। অগভীর পরিবেশবাদীগণ গৌণ অর্থে পরিবেশ সংরক্ষণের অত্যাবশ্যকতার কথা বলেন। বিপরীতক্রমে,গভীর পরিবেশবাদ অনুসারে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের নিজস্ব স্বতঃমূল্য বা অন্তর্মুখী মূল্য রয়েছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি তাদের নিজস্ব স্বকীয় মূল্যের কারণে মূল্যবান। সুতরাং পরিবেশের নিজস্ব মূল্যের কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত। এ ধারার মতাদর্শীগণ মূলত হিন্দুধর্মের 'আত্মাই ব্রহ্ম', স্পিনোজার 'ন্যাচুরা ন্যাচোরাটা' ইত্যাদির সহায়তায় কিংবা অধিবিদ্যক পন্থায় 'ব্যক্তির' সঙ্গে 'প্রকৃতি'র সম্পর্কায়ন করে থাকেন।

সমকালীন বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আগামী দিনের বিশ্ব এবং এর ভবিষ্যত প্রজন্মের অনুকূল পরিবেশের জন্য এই মতবাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

আর্নে নায়েসস হিন্দু 'আত্মার' ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবেশবাদী চিন্তার প্রস্তাব করেন। ভগবৎ গীতায় আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে - "He whose self is harmonized by yoga sees the self abiding in all beings and all beings in self; everywhere he sees the same" (Bhagavad Gita, 6: 29)। এটিকেই গান্ধী অনুবাদ করে বলেন - "The man equipped with yoga looks on all with an impartial eye, seeing fatman in all beings and all beings in Atmn"। নায়েসস গীতা এবং গান্ধীর আত্মা সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে দেখান জগতের মধ্যে আত্মা বিরাজমান। বেদান্ত দার্শনিকদের মতে, 'ব্রহ্ম হচ্ছেন বিশিষ্ট অর্থাৎ জীব-জগত রূপ শরীর বিশিষ্ট। জীব জগত ব্রহ্মের শরীর বলে-ই বস্তু থেকে ব্রহ্ম পৃথক নয়। এজন্য জগতরূপ শরীর বিশিষ্ট হয়েও ব্রহ্ম সর্বদা এক এবং অদ্বিতীয়ই থাকেন। এভাবে ব্রহ্ম ও জগত, আত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন হয়ে থাকেন। নায়েসস বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার আলোকে মানুষের প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতা দেখানো যেতে পারে। এই অবিচ্ছিন্নতাই বলে দিচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ আমাদের সঙ্গে আত্মিকভাবে অবিচ্ছিন্ন , এজন্য এদেরকে সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়।

পল টেইলর মূল্যের বিভিন্ন শ্রেণীকরণ করে দাবী করেন — যে কোন জীবসত্তার বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। জীবসত্তার এই বেঁচে থাকার মূল্যকে টেইলর এবং হোম্‌স রল্‌সটন অন্তর্নিহিত মূল্য 'interest worth' বা বস্তুগত মুল্য বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে লিওপল্ড এর ভূমি-নীতিবিদ্যক মতবাদ থেকে টেইলর ভিন্নমত পোষণ করেন। লিওপল্ড বলেন, কেবলমাত্র জীবিত প্রাণী এবং উদ্ভিদেরই অন্তর্নিহিত মুল্য রয়েছে। কিন্তু টেইলর বলেন, সব জীবিত সত্তা, বস্তুজগতে বিরাজমান পদার্থকণিকার অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর সংরক্ষণশীল মানসিকতা প্রসঙ্গে চারটি নীতি রয়েছে ঃ

১. স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মানুষ এই ভূ-মণ্ডলের বাসিন্দা, অন্যান্য বস্তুসত্তার মত মানুষও বিবর্তনের ক্রমপ্রক্রিয়ায় এই ভূ-কমিউনিটির সদস্য হয়েছে।

২. ভূ-বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য বস্তুসত্তার সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকেন্দ্রিক জৈবসত্তা প্রাণের উদ্দেশ্যধর্মীতাকে ধারণ করে থাকে। অনেকটা তার নিজস্ব মুল্যে বা মঙ্গলের কারণে।

৪. উপরোক্ত তিনটি বচনের আলোকে বলা যায়, মানুষ প্রাণীকূলের মধ্যে সর্বোচ্চ একথা যথার্থ নয়; বরং সকল প্রাণীই মূল্যের দিক থেকে সমান।

অতএব, প্রত্যেকটি জীব কাঠামো বা প্রাণীরাজ্যের সদস্যদের সমান অন্ত র্নিহিত এবং ইতিবাচক মূল্য রয়েছে। সুতরাং, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জৈবসত্তার এই সমতা থেকে বলা যায় প্রত্যেকের সমান মূল্য কামনা করে, তাদের প্রতি আমাদের নৈতিক বিবেচনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

হোমস রল্‌স্টন (১৯৮৮) এবং উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনা (১৯৮৫) প্রাণীর অন্তর্নিহিত মূল্যের কথা বলেন। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুসারী, পরিবেশের নিজস্ব মূল্য রয়েছে। পরিবেশের এই মূল্যের কারণেই তার অস্তিত্ব, সাংগঠনিক কাঠামোকে কোনভাবে বিপর্যস্ত করা উচিত নয়। রল্‌স্টন তো প্রাণের বির্তনের পট পরিক্রমা পর্যালোচনা করে দেখান, প্রাণের বিবর্তন যেহেতু ক্রমশ প্রজাতির সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমিক বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে উচ্চশ্রেণী ও নীচু শ্রেণীর প্রজাতির আবির্ভাব ঘটছে সেহেতু উচ্চশ্রেণীর প্রাণীসমূহকে যে অর্থে অন্তর্নিহিতভাবে মূল্যবান বিবেচনা করা হয়। সেই একই কারণে অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীকে মুল্যহীন বিবেচনা করা যায় না। রোলস্টন এই বক্তব্যের মূলকথাই হল সামগ্রিকভাবে পরিবেশের মূল্যই গুরুত্বপুর্ণ- এই মূল্য আমাদের মানবীয় প্রাণীর মূল্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট। একারণে মানব প্রজাতির মতো পরিবেশের প্রতিও আমাদের গুরুত্বারোপের প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে চলে আসে।

ধর্মীয় নৈতিকতার ভূমিকা

পরিবেশের উপর মানব সভ্যতা নির্মাণের যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে তা বিশ্বের সকল প্রাণীর-ই অস্তিত্বের সঙ্কট তৈরি করে চলেছে, যা প্রতিকারে ধর্মের ভূমিকার কথাও বলা হচ্ছে। ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ - 'Religion' এর মূল অর্থ হলো 'Religare' অর্থাৎ (Binding together), বাংলাতে যার অর্থ

দাঁড়ায় 'একীভূতকরণ'। এই 'একীভূতকরণ নীতি' সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও পরস্পরের মধ্যে সুখ দুঃখের বিষয়গুলিকে ভাগাভাগি করে নেবার চেতনাকে উজ্জীবিত করে থাকে। বলা বাহুল্য এই চেতনা পরিবেশের বিপর্যয় তথা সভ্যতার সঙ্কট নিরসনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিশ্বজনীন প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যে (World religions) মানবিক চেতনা পরিলক্ষিত হয়। যদিও বাস্তবে এর চর্চা সব সময় সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ব্যাত্যয়হীনভাবে পালন করতে দেখা যায় না। যেমন, খ্রীষ্টান ধর্মীয় শিক্ষার মূলে রয়েছে প্রভুর প্রতি ভালোবাসা ও যার প্রতিফলন ঘটে মানুষের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে এবং প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বাইবেলের জেনেসিস– যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তারও মূলকথা হল - ঈশ্বরের নিজস্ব প্রতিমার মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি অন্যান্য কিছুও সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য এবং সেসব সৃষ্টজীবকে বলেছেন -

> "Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it : and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that mouth upon the earth." [Bible, Old testament 1: 26]

আদিপুস্তকে ঈশ্বর মানুষকে এরকম 'কর্তৃত্ব করার' ক্ষমতা প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর প্রদত্ত এই ক্ষমতাই ইঙ্গিত করছে - মানুষ তার প্রয়োজন প্রকৃতি বা পবিেশকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু ধর্মনির্ভর এরকম স্থূল অনুভূতির কারণে মানুষ হয়তো যুক্তি দাঁড় করাতে পারে যে, প্রকৃতি ও পরিবেশকে মানুষের প্রয়োজনে ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করতে পারবে। ইসলামের বিশ্বজনীন অবদানের প্রমাণ হলো 'তাওহিদ' বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। এর অর্থ এবং তাৎপর্য হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নেই এবং তিনি স্বর্গীয় সত্তার প্রতীক এবং সকলের জন্য ওহী স্বরূপ। ইহুদী ধর্মে মানুষকে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রভুর অংশীদার হিসেবে দেখানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মে একক বিশ্বের অধিবাসী হিসেবে মানুষে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে জগতের সবকিছুর মধ্যে রয়েছে আন্তসম্পর্ক। আর এক্ষেত্রে মানুষের মূল কাজ হলো উচ্চতর ঐক্যের সন্ধান খুঁজে বের করা। প্রকৃতির প্রতি আমাদের আগ্রহ, সহানুভূতি এবং কল্যাণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন করার মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা সমুন্নত

করতে পরি। যেমন- একটি সমাজ যার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য এবং উপাদান আছে, অথচ কিয়দংশ মানুষকে বঞ্চিত না করেও প্রাণীর জন্য সরবরাহ করা যায়, তাছাড়া ব্যাপক জনগোষ্ঠী আছে যারা ইচ্ছে করলে তাদের অর্থ ও সময় উভয়ই খরচ করে প্রাণীদের পোষ্য এবং বন্যপ্রাণী প্রদর্শনীর জন্য সংগ্রহ করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে (ভূইয়া, ২০০১)।

হিন্দু, অরফিক, বৌদ্ধ, জৈন এবং পীথাগোরীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেও আমরা প্রকৃতির প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারি। হিন্দু পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ-এ প্রত্যক্ষভাবে মানুষ থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হবার পরোক্ষ ঈঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এর মূল কথা হল- পুনর্জন্ম অর্থই হল- মানুষ এজগতের যে কর্ম করবে তদনুযায়ী তার আত্মা পুনরায় দেহ ধারণ করবে। সকল কর্মের ফলশ্রুতিই হল পুনর্জন্মের মাত্রাগত ভিন্নতা।

হিন্দু জন্মান্তরবাদের ধারণা পাওয়া যায় পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক ব্যাখ্যায়। বস্তুত অরফিক দলভুক্ত লোকদের বিশ্বাস দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অরফিকদের পুনঃআবির্ভাব তত্ত্বের (Theory of incarnation) মূলকথাই হল জগত হল বস্ত-চক্র (Wheel of things), মানুষ তার সকল প্ররোচনায় নিজেকে এ চক্রে জড়িয়ে ফেলে। বস্তু-চক্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে সূত্রটি পীথাগোরীয় দার্শনিকগণ একটু ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করেন, সজীব প্রাণের সঙ্গে জৈবিক প্রাণের (মানবেতর এবং উদ্ভিজ্জগতসহ) যোগসূত্র রয়েছে, এ যোগসূত্রের মধ্যস্থতায় বিরাজ করে ঐশ্বী আত্মা; পীথাগোরীয়দের ভাষায় এটিই হল 'Soul daemons' । তাঁদের মতে, আত্মাকে 'transmigrate' করার জন্য এবং জন্মান্তরে মানবেতর প্রাণীর আকার গ্রহণ করা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন নৈতিক রীতিনীতির অনুশীলন।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হিন্দু, অরফিক এবং পীথাগোরীয় নৈতিক চিন্তার ফলত পরিণতি হল আত্মার মুক্তি লাভ। জন্মান্তরে আত্মা যেন উদ্ভিদরাজি, স্থুল শরীর, মানবেতর প্রাণী হয়ে না জন্মায় সেদিকে ছিল

তাদের দৃষ্টি। সুতরাং, এসব ধর্মীয় জন্মান্তরের ধারনায় মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী নিকৃষ্ট একথাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এ বিবেচনায় বৌদ্ধ ও জৈন নৈতিক তত্ত্বে আরো উদার ও প্রগতিশীল। বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার ও পঞ্চশীল' নীতি প্রত্যক্ষভাবে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা নিবদ্ধ করা হয়েছে। বৌদ্ধ পঞ্চশীলের প্রথম শীলই হল 'প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা'। দুঃখময় জীবন থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হলো উক্ত শীলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

বুদ্ধের আরো দুটি নীতির কথা ধরা যাক -'সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন করো' - কিংবা 'পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হউক, ভয়হীন নিরুপদ্রব হউক' - এই উক্তি দ্বারা তিনি মূলত প্রাণীকূলের সকল সদস্য দৃশ্য অদৃশ্য, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থুল-অতিকায়, নির্বোধ-বোধ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীকূলের নিরুপদ্রব অবস্থাই ছিল তাঁর কাম্য। আবার বুদ্ধের অহিংস নীতিতে আমরা খুঁজে পাই পৃথিবীর সকল প্রাণীকে সমভাবে দেখার এক মহান শিক্ষা। *সুওনিপাত* এর ভাষায় এই শিক্ষার গুরুত্বটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে - "মা যেমন আপন সন্তানের জীবন প্রাণের বিনিময় রক্ষা করতে চান, শিশুর দুঃখ বেদনায় কাতর হন, ঠিক সেরকম সকল জীবের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করতে হবে।" সুতরাং, বৌদ্ধ নৈতিক চিন্তায় মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হবার নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। চীনা আধ্যাত্মিক ধারাগুলিতে সঙ্গতি কে প্রকৃতি ও সমাজের অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে জ্ঞান করা হয়েছে। যেমন, কনফুসিয়ানবাদে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সামর্থের নৈতিক নীতিমালায় মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে 'সঙ্গতিকে' বেছে নেওয়া হয়েছে। টাওবাদে (Taoism) প্রকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য 'সঙ্গতি'কে একটি উৎকৃষ্টতম ধারণা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বাহাই (Bahai) বিশ্বাসে বলা হচ্ছে, 'ঐক্য ও শান্তির' লক্ষ্যে যে ক্রম পরিবর্তনশীল বিবর্তন ধারা রয়েছে সেই ধারায় গোটা মানবগোষ্ঠী হলো একটি জৈবিক উপাদান বিশেষ। যা হোক উপর্যুক্ত নৈতিক পর্যালোচনা থেকে আমরা ধরে নেব, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, চৈনিক, বাহাই এবং পীথাগোরীয় নৈতিক চিন্তায় মানুষের মুক্তি বা মোক্ষলাভের প্রশ্নটি মুখ্য হলেও প্রাণীর মুক্তির বা প্রাণীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের প্রসঙ্গটি হেয় করে দেখা হয়নি।

উপসংহার

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সভ্যতার অবয়ব ও পরিসর বৃদ্ধি করলেও নিশ্চিত জীবন-যাপনকে করে তুলছে সঙ্কটাপন্ন। আমাদের বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যত পরিবেশও হয়ে উঠছে জীবন যাপনের অনুপযোগী। তাই আমাদের আগামী দিনের পৃথিবীর কথা ভেবে পরিবেশ সংরক্ষণ, অন্যভাবে মানুষের নিশ্চিত ভবিষ্যত সংরক্ষণে প্রয়াসী হওয়া উচিত। এজন্য পরিবেশবিদগণ পরিবেশ সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নৈতিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আসছেন। আইন ও নৈতিক-চেতনা এ দুটিকে সমন্বিত করে আমরা প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কায়নের মাধ্যমে নব্য-মানবতাবাদের নতুন আঙ্গিক বিন্যস্ত করতে পারি। পাশাপাশি, এই সঙ্কট দূর করার ক্ষেত্রে যে প্রয়াশগুলো মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারবে তার অন্যতম প্রধান শর্ত হল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পরিবেশসম্মত তত্ত্ব ও গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করা। এক্ষেত্রে যে পরামর্শগুলো চরমপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে 'বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা' ও 'পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণের' মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি করতে পারবে তা-ই হবে সঙ্কটাপন্ন মানুষ ও প্রাণীজগতের অস্তিত্ব রক্ষার মূল কৌশল। এই কৌশল ও কর্মপন্থা সুপারিশের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ, পরিবেশ আইন , পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুকূল ধর্মীয় চেতনা, মানুষের প্রতি মানুষের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়াজাত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উল্লেখ্য, এসব নৈতিক চেতনার সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশীকরণ মানসিকতা সভ্যতা ও পরিবেশ সঙ্কট নিরসনে ইতিবাচক প্রেক্ষাপট তৈরী করতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা :

Caumoneur, Bary (1972), ***'The closing Circles', Nature, Men and Technology,*** New York, Stephnoskyv, G.A, (1973), *And His Habitat*, Vo-Procy Philosphy,

Charter For scientific (1963), ***Works And constitution of the World Federation of Scientific Works*** (*WFSCW*, London 1965).

Commission of the European communities (CEC, 1993), ***Environmental Manual***, Directiorate General for Development, Brussel.

Fadayev, E.T., ***'Problems of Envirnmental Production', In Philosophy and Ecological Problems of Civilisation,*** ed. by Ursul, A.D., Pregress Pub., 1st print 1983.

Frankena, William. K. (1945***), 'Ethics and the environment', In Contemporary Moral Problems,*** ed. by J.P. Whlu, New York, West publishing Co. st. Pau.

পাল, গৌতম (১৯৯৩), *পরিবেশ ও দূষণ,* কলকাতা।

P.H.D. Forest, (1975***), The International Scientific Community And the Global Social*** responsibility of Scientists, *Encyclopedia Moderna.*

Perroni, C. and Wigle, R.M. (1994***), Modelling the Links between International Trade and the Environment*** (mimeo), Wilfricd Laurier University, June 1992.

Pojman, Louis. P. (2000***), Global Envirnmental Ethics,*** Mayfield Pub. Co., California.

Rolston-III, Holmes (1988***), Environmental Ethics, Philadelphia*** : Temple University press,

Russel lenstein,(1955) *Manifesto,*

Schwitzer, A. (1987), ***Civilisation and Ethics,*** London, Adam and Charles Black.

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ (২০০১***), 'মানবেতর প্রাণীর অস্তিত্ব সংরক্ষণ ঃ প্রসঙ্গ নৈতিকতা',*** দিদাসকালোস, কলা ও মানবিকী অনুষদ সেমিনার জার্ণাল, সংখ্যা-১, সম্পাদনায়. ডঃ আফসার আহম্মেদ